শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানমহোৎসব

প্রব্রাজিকা বীতভয়প্রাণা

সন্ন্যাসিনী, শ্রীসারদা মঠ

উৎকলীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য ও জনজীবনের জীবনীশক্তি মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ। অদ্ভুত তাঁর লীলাবিলাস, অপার তাঁর করুণা, অনন্ত তাঁর ভালবাসা। তিনি অন্ত্যজ দাসিয়া বাউরির কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে নারকেল গ্রহণ করেন, যবন সালবেগের ভক্তিতে বাঁধা থাকেন, বেগুনক্ষেতে গিয়ে কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হন কৃষককন্যার সুললিত গীতগোবিন্দ গানের টানে, সোনার থালায় মহাপ্রসাদ খাইয়ে দরিদ্র সখা 'বন্ধু মহান্তি'র আপ্যায়ন করেন।

দৈনন্দিন লীলায় তিনি ঘুম থেকে ওঠেন, মুখ প্রক্ষালন, দন্তমার্জন, স্নান, পোশাক পরিধান করেন; ওড়িয়া পিঠে, মিষ্টি, পান্তাভাত, ডালমা ইত্যাদি; শেষে তাম্বুল গ্রহণ করেন। ওড়িশায় বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিকতায় প্রথম বরণীয় অতিথি তিনি। ভক্তসঙ্গে মান-অভিমান, হাস্য-পরিহাস, মেলা-মহোৎসবে মেতে ওঠেন। পরম মমতায় মানবীয় লীলার মাধ্যমে মানবসন্তানকে কোলে তুলে নেওয়ার অন্তহীন প্রচেষ্টা তাঁর। স্নানযাত্রা তাঁর এমনই এক মাধুর্যমণ্ডিত লীলা।

ভক্তাধীন ভগবান বাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁর কাছে সম্পদ, বিদ্যা, রূপ, বংশমর্যাদা, ধর্ম, কুল, গোত্র নয়—ভক্তিই শেষ কথা।

স্কন্দপুরাণে উৎকলখণ্ডের 'শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র- মাহাত্ম্য' থেকে জানা যায়, মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক রত্নসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রীজগন্নাথ প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর পূজাবিধি ও যাত্রা, উৎসব সম্পর্কে দিঙ্‌নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর প্রথম উপদেশ ছিল—জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় তিনি দারুব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ বলে দিনটি তাঁর পুণ্য জন্মতিথি; সেদিন তাঁর মহাস্নান হবে।

এই প্রসিদ্ধ আদ্য যাত্রার মাহাত্ম্য ও মহাস্নানবিধি সম্পর্কে ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, কপিল সংহিতা, বামদেব সংহিতা, নীলাদ্রি মহোদয়, যাত্রা ভাগবত ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বিশেষত স্কন্দপুরাণে 'শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রমাহাত্ম্য' অংশে (৩১। ২৬-৯৭) প্রসিদ্ধ স্নান মহোৎসব বা আদ্য উৎসব সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে। 'যাত্রা ভাগবত' থেকে জানা যায় যে 'উদয়া পূর্ণিমা' (জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা) তিথিতে এই যাত্রা পালিত

হয়; এই তিথি উক্ত যাত্রার জন্য প্রশস্ত; এটি শ্রীজগন্নাথের আবির্ভাব- তিথি। 'নীলাদ্রি মহোদয়'-ও একই কথা বলেন।

মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রাচীন অবন্তী নগরীর, পরবর্তী কালের মালবের রাজা ছিলেন। ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রবল অধ্যবসায়ে তিনি জগন্নাথদেবকে প্রতিষ্ঠা করলে সুপ্রসন্ন মহাপ্রভু তাঁকে কিছু বর দিতে চান। ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—যে-বৃদ্ধ কারিগর জগন্নাথ-বলভদ্র-সুভদ্রার বিগ্রহ নির্মাণ করেছেন, তাঁর বংশধরেরাই যেন তাঁদের রথ নির্মাণ করেন। মহাপ্রভু রাজি হন। সেই থেকে শিল্পী বিশ্বকর্মার বংশধররাই রথনির্মাণ করে থাকেন। শ্রীভগবানও নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন, ''আমার নীলমাধব বিগ্রহের সেবা করত যে শবররাজ বিশ্বাবসু তারই বংশধরেরা 'দইতা' নামে আমার সেবক হয়ে থাকবে। তোমার মন্ত্রী বিদ্যাপতি, যাকে তুমি আমার সন্ধানে পাঠিয়েছিলে, তার ব্রাহ্মণ সন্তানের বংশধরেরা আমার পূজক হবে। আর বিদ্যাপতির শবরী পত্নীর সন্তানের বংশধরেরা 'সুআর' নামে পরিচিত হয়ে আমার ভোগ রন্ধনের দায়িত্ব নেবে।" এরপর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রার্থনা করলেন, ''আপনি সারাদিন বিশ্বের যেখানে যান না কেন, রাতে শ্রীমন্দিরে অবস্থান করবেন। আপনার শ্রীমন্দিরের দরজা এক প্রহর অর্থাৎ সারাদিনে মাত্র তিন ঘণ্টা বন্ধ থাকবে, বাকি সময় জগদ্‌বাসী আপনাকে দর্শন করে ধন্য হবে। আর আপনার হাত কখনও শুকনো থাকবে না। তাহলে সারাদিনে কখনও জগৎ আপনার প্রসাদ সেবন থেকে বঞ্চিত হবে না। শেষ প্রার্থনা—আপনি আমাকে নির্বংশ করুন, যাতে ভবিষ্যতে আমার কোনও বংশধর আপনার মন্দিরকে তার নিজের সম্পত্তি বলে দাবি না করতে পারে।" সুপ্রসন্ন হাস্যে সমস্ত প্রার্থনা পূরণ করে শরণাগতকে কৃতার্থ করলেন ভগবান।

মহাপ্রভুর দ্বাদশ যাত্রার মধ্যে বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা এবং ফাল্গুনে দোলযাত্রা প্রধান। আবার এই চারটির মধ্যে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই স্নান কোনও কোনও গ্রন্থে দেবস্নান ও মঞ্চস্নান নামেও বর্ণিত হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে এই স্নানলীলা দর্শন করে ধন্য হন। তাই এটি 'পতিতপাবন লীলা' নামেও পরিচিত।

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানবেদি বা স্নানমঞ্চটি প্রথম নির্মাণ করেছিলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। কালের প্রভাবে সেই বেদি ক্ষয়প্রাপ্ত হলে উৎকলের গঙ্গবংশীয় রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের রাজত্বকালে শ্রীমন্দির-পরিসরে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদির সাহায্যে অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে চাঁদোয়া, পত্র, পুষ্প, চামর ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হত। সেখানে শ্রীবিগ্রহদের স্নানোৎসব অনুষ্ঠিত হত বলে তা 'মঞ্চস্নান' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সূর্যবংশীয় রাজা কপিলেন্দ্রদেব মন্দিরের চারপাশে 'মেঘনাদ' প্রাচীর নির্মাণ করে দিলে বর্তমানের আনন্দবাজার পরিসরস্থ পূর্বদিকে প্রাচীরের দশ ফুট দূরত্বে প্রস্তরনির্মিত সুউচ্চ স্থায়ী স্নানমণ্ডপটি নির্মিত হয়।

পূর্বে তিনটি শ্রীবিগ্রহ সব কটি যাত্রাতেই রত্নসিংহাসন থেকে নেমে এসে দর্শন দিতেন। পরে অবয়ব সুরক্ষার কারণে কেবলমাত্র স্নানযাত্রা ও রথযাত্রায় তাঁদের রত্নসিংহাসন থেকে নামানো হয়। অন্য যাত্রাগুলিতে মহাপ্রভুর প্রতিনিধি মদনমোহনই অংশগ্রহণ করে থাকেন। স্কন্দপুরাণে আছে, শ্রীজগন্নাথ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলেন, ''সমুদ্রতীরে অক্ষয়বটের উত্তরে একটি কুয়োতে সর্বতীর্থের জল আছে। কিন্তু কুয়োটি বালিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। শ্রীক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমি আমার স্নানের জন্য কুয়োটি খনন করিয়ে রেখেছিলাম। এখন তার পুনরুদ্ধার ও সংস্কারের প্রয়োজন।" লীলাময় প্রভু তাঁর আবির্ভাবের আগেই স্নানযাত্রার লীলামাধুর্য প্রকাশের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্নকে তিনি বলেন, ''রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিকপালদের পূজা করে চতুর্দশীতে কুয়োটির সংস্কার করবে। ব্রাহ্মণগণ সোনার কলসে কুয়োর জল তুলে রাখবেন। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার প্রাতে সেই জলে বলভদ্র ও সুভদ্রা সহ আমাকে স্নান করাবে।''

শ্রীমন্দিরের উত্তর দ্বার বা হস্তিদ্বারের প্রথম তোরণের পর দক্ষিণে শীতলা দেবী ও তাঁর বাহন সিংহের মধ্যস্থলে কুয়োটি অবস্থিত। সেটি শ্রীমন্দিরের পরিভাষায় 'প্রণীতা কূপ' ও ভক্তদের মুখে 'সোনার কুয়ো' নামে পরিচিত। লোকবিশ্বাস, দেবীবাহন সিংহই এই কুয়োকে প্রহরা দেন। জনশ্রুতি, স্নান উৎসব উপলক্ষ্যে অতীতে ভারতের সমস্ত তীর্থস্থান থেকে জল সংগ্রহ করা হত এবং স্বর্ণপাত্রে এই কুয়োর মধ্যে নিমজ্জিত করে রাখা হত। স্নানপূর্ণিমার দিন সেই জলে জগন্নাথ মহাপ্রভুকে স্নান করানো হত। কুয়োটি পঞ্চাশ ফুটের বেশি গভীর ও গোলাকৃতি, সর্বদা চতুষ্কোণ একটি সিমেন্টের ঢাকনা দ্বারা আবৃত থাকে। সারা বছর এই কুয়োর জল অব্যবহৃত থাকে। স্নানযাত্রার পূর্বদিন কুয়োটির সংস্কার করে জলশূন্য করা হলেও পরদিন পূর্ণিমা তিথিতে এটি জলপূর্ণ হয়ে যায়।

স্নানযাত্রার দিন গজবেশ

স্নানযাত্রার দিন তিনটি বিগ্রহের নির্দিষ্ট সেবকগণ সোনা কুয়ো থেকে একশো আটটি কুম্ভে জল তুলে রাখেন। জল তোলার সময় 'পাবমানী' নামে বিশেষ মন্ত্র পাঠ করা হয়। ত্রিফলা, কৃষ্ণ অগুরু, কস্তুরী, কর্পূর, ঘৃত, মধু, চন্দন ইত্যাদি তেরোটি পদার্থ এই জলে মেশানো হয়। একশো আট কুম্ভের জলকে ষোড়শোপচারে পূজা করা হয়। শ্রীবলভদ্রকে তেত্রিশ কুম্ভ, শ্রীজগন্নাথকে পঁয়ত্রিশ, দেবী সুভদ্রাকে বাইশ ও সুদর্শনকে আঠারো কুম্ভ জলে স্নান করানো হয়। বিগ্রহদের স্নান করানোর দায়িত্ব 'মুদিরথ' নামক সেবকদের উপর ন্যস্ত থাকে। যতদিন তাঁরা অবিবাহিত থাকেন, ততদিনই তাঁরা এই সেবার সুযোগ পান। অদূরে 'চাহানী' (চাউনি) মণ্ডপ থেকে দেবী লক্ষ্মী জগন্নাথদেবের মহাস্নান দর্শন করেন।

স্নানপর্বের পর গোবর্ধন মঠের পীঠাধীশ্বর পরম পূজ্যপাদ জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে আসেন। তারপর শ্রীজগন্নাথের আদ্য সেবক গজপতি মহারাজ চতুর্ধা মূর্তির সম্মার্জনী সেবা করেন যাকে স্থানীয় ভাষায় 'ছেরা পহরা' বলা হয়। কর্পূরারতি করে মহারাজ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন। তারপর তাঁদেরকে ভোগ নিবেদন করা হয়। স্নানোৎসবে বিভিন্ন সেবায় থাকেন পাঁচশোরও বেশি সেবক। তাঁদের মধ্যে তিনশো জন 'সুআর' দীর্ঘসময় ধরে বিপুল পরিমাণ নৈবেদ্য স্নানমণ্ডপে নিয়ে আসার দায়িত্বে থাকেন।

ভোগ নিবেদনের পর বিগ্রহদের গণেশবেশ বা হস্তিবেশ করানো হয়। প্রত্যেকটি বেশের অন্তরালে মহাপ্রভুর কোনও না কোনও লীলা বিদ্যমান। এই গণেশবেশের হেতুও একটি মাধুর্যমণ্ডিত লীলা।

সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনা। কর্ণাটকের কানিয়ারি গ্রামের এক শাস্ত্রজ্ঞ, দয়ালু, নির্লোভ

ব্রাহ্মণ ছিলেন গণপতি ভট্ট। তিনি গাণপত্য সম্প্রদায়ের সাধক, গণেশ তাঁর ইষ্ট। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হলে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে নিস্তার পাওয়া যায় জেনে ব্রাহ্মণ সর্বদা ভাবতেন কেমন করে তাঁর ভগবানলাভ হবে। একদিন ব্রহ্মপুরাণ থেকে জানতে পারলেন, পরব্রহ্ম এখন নীলাচলে জগন্নাথরূপে পূজিত। কবে জগন্নাথদর্শন করে মুক্তিলাভ করবেন—এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। অনতিবিলম্বে গণপতি শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করলেন। ব্রহ্মপুরাণ গ্রন্থটি নিয়ে কেবল ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে পুরীর নিকটস্থ 'আঠারো নালা' স্থানে পৌঁছলেন। উৎফুল্ল ভক্তদের আসতে দেখে গণপতি জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনারা অত আনন্দ নিয়ে কোথা থেকে ফিরছেন? আপনাদের হাতেই বা কী?'' যাত্রীরা জানালেন যে তাঁরা জগন্নাথদর্শন করে মহাপ্রসাদ নিয়ে ফিরছেন। গণপতি ভট্টের মনে সন্দেহ হল। ভাবলেন, শ্রীজগন্নাথ তাহলে ব্রহ্ম নন। যদি ব্রহ্ম হতেন তাহলে এই যাত্রীরা ব্রহ্মদর্শনের পর ফিরে আসতে পারতেন না, ব্রহ্মলীন হয়ে যেতেন। ব্রহ্মপুরাণে তো তাই লেখা আছে।

সঙ্গে থাকা ব্রহ্মপুরাণটি আবার খুলে দেখলেন গণপতি। হ্যাঁ, তাই তো লেখা। লেখা আছে পরব্রহ্ম দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথরূপে শ্রীক্ষেত্রে বিদ্যমান। আর তাঁর দর্শনে জীব মোক্ষলাভ করে। ভেঙে পড়লেন গণপতি। ভাবলেন, ''সমস্ত পরিশ্রম আমার বৃথা। ব্রহ্মদর্শন না হলে এ-জীবন রেখে লাভ কী? আমার আত্মহত্যা করাই শ্রেয়।'' গণপতি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে শ্রীজগন্নাথ এক ব্রাহ্মণের বেশে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর মনোবেদনার কথা শুনলেন। তারপর বললেন, ''না, প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু। ভক্তের অভিলাষ তিনি পূরণ করেন। যে মুক্তির ইচ্ছা নিয়ে তাঁকে দর্শন করবে, তার সে-ইচ্ছাও তিনি পূরণ করবেন।'' একথা শুনে গণপতি শ্রীমন্দিরে এলেন। সেদিন স্নানপূর্ণিমা। স্নানের পর শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করলেন তিনি, কিন্তু গণেশের মতো শুঁড় না দেখে ভাবলেন, ''আমার ইষ্ট গজানন পরব্রহ্ম। জগন্নাথ পরব্রহ্ম হলে তাঁর শুঁড় কোথায়! ইনি তাহলে পরব্রহ্ম নন।'' মনের দুঃখে শ্রীজগন্নাথকে প্রণাম না করেই গণপতি ফিরে গেলেন। ভক্তের কষ্ট অন্তর্যামীকে বিচলিত করে তুলল। শ্রীমন্দির পরিসরে কর্মক্লান্ত সেবক 'মুদিরথ' ঘুমিয়ে ছিলেন। স্বপ্নে তাঁকে শ্রীজগন্নাথ গণপতির কথা জানিয়ে বললেন, ''তুমি গণপতিকে বলো জগন্নাথ পরব্রহ্ম, বাঞ্ছাকল্পতরু। যে যে-রূপে চায় তিনি তাকে সেই রূপে দর্শন দেন।'' মুদিরথ উঠে পড়লেন এবং গণপতিকে খুঁজে বার করে সব বুঝিয়ে বললেন।

মুদিরথের কথায় গণপতি জগন্নাথদর্শনে গিয়ে দর্শন করতে করতে বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন! ইনি তো সাক্ষাৎ গজানন, তাঁর হৃদয়াধিপতি! এত মূঢ় তিনি, প্রভুকে চিনতে পারলেন না! তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গণপতি আর উঠতে পারলেন না, পরমবাঞ্ছিতের শ্রীচরণে চির আশ্রয় নিলেন। স্নানপূর্ণিমায় মহাপ্রভুর গজানন বেশ এই মধুর লীলার স্মারক।

এই প্রসঙ্গে সন্তকবি তুলসীদাসের কথা মনে হয়। রামভক্ত কবি সমস্ত বিষ্ণুতীর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যে বার হয়ে শ্রীক্ষেত্রে এসেছেন। কিন্তু এ কী? শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর পরিবর্তে তিনি জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে দেখছেন! ভগ্নহৃদয়ে তুলসীদাস ফিরে গেলেন ও নিকটবর্তী মালতিপাটপুর গ্রামে রাত্রিযাপন করলেন। স্বপ্নাদেশ পেলেন, ''যে শ্রীরাম সে-ই শ্রীজগন্নাথ।'' তুলসীদাস আর কালবিলম্ব না করে শ্রীমন্দিরে ছুটলেন। রত্নবেদিতে শ্রীরামচন্দ্র সহ মা সীতা ও লক্ষ্মণকে দর্শন করে ভাবাবিষ্ট হয়ে গেয়ে উঠলেন, ''জয় জগন্নাথ জগ দেবা, শিব বিরঞ্চি নারদ করে সেবা।'' এখনও শ্রীজগন্নাথদেবের শয়নের পূর্বে ভক্তকণ্ঠে বাদ্যযন্ত্র সহ এই পদটি গীত হয়ে থাকে। ভক্তাধীন

ভগবান বাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁর কাছে সম্পদ, বিদ্যা, রূপ, বংশমর্যাদা, ধর্ম, কুল, গোত্র নয়—ভক্তিই শেষ কথা। ভক্তকবি সালবেগ তাই গেয়েছেন, ''একা তো ভকতজীবন, ভকত নিমন্তে তোর শঙ্খচক্রে চিহ্ন।'' অর্থাৎ হে প্রভু, ভক্তই তোমার জীবন, ভক্তের নিমিত্তই তুমি শঙ্খচক্র ধারণ করে থাক। সময়ের স্রোতে অব্যাহত এই লীলা। ভক্ত-ভগবানের লীলামাধুরীর রসধারা সর্বকালে বহমান।

মহাপ্রভুর সেবার দায়িত্ব কেবল শ্রীমন্দিরই বহন করেন না, শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিত সমস্ত মঠ জগৎপতির সেবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। স্নানপূর্ণিমায় বিগ্রহদের গজানন বেশের দায়িত্ব বিভিন্ন মঠ বহন করে থাকেন। প্রভু বলভদ্রের বেশের দায়িত্ব নেন গোপালতীর্থ মঠ এবং জগন্নাথদেব ও দেবী সুভদ্রার বেশের দায়িত্ব নেন শ্রীরাঘবদাস মঠ। এই সেবায় জগন্নাথ-বলভদ্র গজানন বেশে ও মা সুভদ্রা মাতঙ্গী বেশে সজ্জিত হন। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে হবিষ্যপালন করে এই বেশ নির্মাণ আরম্ভ হয়।

স্নানোৎসবের পর রত্নবেদিতে বিগ্রহেরা ফিরে যান। গর্ভমন্দিরের পরে থাকা শ্রীমন্দিরের অংশটি 'বিমান' নামে পরিচিত। এই বিমানে বহু বিচিত্র বস্ত্রের উপর তিন হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে বিগ্রহদের চিত্রিত করা হয়। শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মে সুশোভিত শ্রীকৃষ্ণ, হল-মূষলে সুশোভিত বলরাম ও পদ্মাসনে মা সুভদ্রার চতুর্ভুজ পটচিত্র বাঁশের দরমার অভ্যন্তরে রাখা হয়। এখানে মা সুভদ্রার দুহাতে অভয়মুদ্রা, দুহাতে পদ্ম। অত্যধিক স্নানের ফলে জ্বরে পীড়িত মহাপ্রভু স্নানপূর্ণিমা থেকে নেত্রোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত এই পটবিগ্রহেই পূজা নেন। তাঁদের প্রতিবিম্বে বিধিপূর্বক পঞ্চামৃতে মহাস্নান হয়। এই বাঁশের দরমার মধ্যে কেবলমাত্র বিশ্ববসু ও বিদ্যাপতির বংশধরগণ সেবকরূপে প্রবেশ করতে পারেন। স্নানযাত্রা-রথযাত্রার মধ্যবর্তী এই বিধিবিধানকে 'অণসর' বলা হয়। 'অণসর' শব্দটি সংস্কৃত 'অনবসর' (ন অবসরঃ) থেকে এসেছে। দইতাপতিদের গুপ্তপূজা বা সেবাপূজা ও চিকিৎসায় আপ্যায়িত প্রভু শ্রীজগন্নাথের ভক্তদের দর্শন দিতে অবসর থাকে না। এই পনেরোদিন জলবায়ুতে এক বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ওড়িশার আরাধ্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের জ্বর হওয়ায় স্থানীয় জলবায়ুতে অসহ্য গরম অনুভূত হয়, যা 'অনবসর গুলিগুলি' (গুলিগুলি অর্থাৎ গুমোট) নামে কথিত।

জ্বরের সময় মহাপ্রভুকে অন্যান্য দিনের মতো ভোগ নিবেদন করা হয় না। নিবেদন করা হয় আম, কাঁঠাল, আনারস, আতা ইত্যাদি ফল; নানারকম আয়ুর্বেদীয় পদার্থে তৈরি সরবত বা পাঁচন; তিলের তেল, কর্পূর ইত্যাদি থেকে প্রস্তুত 'ফুলরি তেল' যা এক বছর আগে থেকে মাটিতে পুঁতে রাখা থাকে। এই পনেরো দিনে বিগ্রহদের অঙ্গরাগ করা হয়। ষোড়শ দিনে নতুন বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে তাঁরা ভক্তদের দর্শন দেন। এটি নেত্রোৎসব নামে পরিচিত। তারপর মহাসমারোহে হয় রথযাত্রা।

স্নানপূর্ণিমা ছাড়া বছরে প্রতিদিন বিগ্রহদের স্নান সম্পাদিত হয় দর্পণে পরোক্ষভাবে, যা বিম্বস্নান নামে পরিচিত। বছরে এই একবারই প্রত্যক্ষ স্নান হয় স্নানবেদিতে। তত্ত্ব ও ভাব নির্বিশেষে, ইতিহাস ও কিংবদন্তিতে মিলেমিশে একাকার এই স্নানোৎসব এক দেবদুর্লভ লীলা। ভক্তের স্থির বিশ্বাস, স্নানমণ্ডপে তাঁদের পুণ্যদর্শনে মুক্তি করতলগত।

গীতার শ্লোক, ভাগবতের তত্ত্ব, মহাভারতের নীতি ও ভাব বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু শ্রীজগন্নাথকে বোঝা বড়ই সহজ। তিনি বিশ্বাসের গোচর। ভক্তি তাঁর প্রিয়। তিনি নিরাকার, অক্ষয়, অবিনশ্বর হয়েও ভক্তগতপ্রাণ। ভক্তের মনোহরণ করবেন বলেই তিনি লীলাতৎপর।